অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 257-266
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.036

MUKUNDARAMER SMRITIDHONNO MEDINIPURER ARRA GARER JAYCHONDI MONDIR O MURTI SOMPORKITO SUKUMAR SENER OBHIMOT : PARYALOCHONA O SATYASATYO BICHAR / মুকুন্দরামের স্মৃতি-ধন্য মেদিনীপুরের আড়রা গড়ের জয়চণ্ডী মন্দির ও মূর্তি সম্পর্কিত সুকুমার সেনের অভিমত: পর্যালোচনা ও সত্যাসত্য বিচার

SUVASIS ACHARYA / শুভাশিস আচার্য
সহকারী অধ্যাপক, রানী ইন্দিরা দেবী সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়
Email: 1988acharyasuvasis@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, মেদিনীপুর, ব্রাহ্মণভূম আড়রা গড়, গড় সেনাপোতা, বাঁকুড়া রায়, রঘুনাথ রায়, দ্বিজ শ্রীধর, কেশিয়াড়ি, সর্বমঙ্গলা, শিলালিপি, চক্রধর শর্মা, বিজয়া মঙ্গলা

Abstract:

অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুরের উত্তরাংশের প্রাচীন পরগনা ব্রাহ্মণভূমস্থিত আড়রা গড় কবি মুকুন্দরামের স্মৃতিধন্য। গড়ের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়ের বদান্যতায় মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য কবিকঙ্কন চণ্ডী রচিত হয়। এই দেবী চণ্ডীর সঙ্গে জড়িত রয়েছে স্থানীয় জয়চণ্ডী মন্দিরের ইতিহাস। এই মন্দিরের সময়কাল এবং দেবী মূর্তি নিয়ে লেখক, সমালোচকদের মধ্যে নানান মতদ্বৈধতা বর্তমান। সেই সকল অভিমত সত্যাসত্য বিচারের দাবী রাখে। ঠিক যেমন সুকুমার সেনের মতো প্রথিতযশা পণ্ডিতের কয়েকটি অভিমতের যথার্থতা বিচারে প্রয়াসী আমরা। তাঁর বিচারে এই জয়চণ্ডীর প্রাচীন মন্দির এবং বর্তমান আড়রা সন্নিহিত জয়পুরের জয়চণ্ডী মন্দির এক নয়। কিছু তথ্য প্রমাণের সাপেক্ষে আমাদের বিচারে আড়রা গড় হতে এক কিমির মধ্যে জয়পুরেই ছিল জয়চণ্ডীর প্রাচীনতম মন্দির। সেন মহাশয় যতই বলুন এই জয়চণ্ডী মন্দির এবং দেবী মূর্তি বাঁকুড়ারায় কিংবা তাঁর পূর্ববর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমাদের বিচারে তা যথার্থ নয়। গোপাল এবং কামেশ্বরের অর্থাৎ বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্মের প্রধান উপাসক এই জমিদার পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন প্রচারের পরেই বোধ হয় জয়চণ্ডী মন্দির নির্মিত হয়। তাছাড়া জয়চণ্ডী মন্দিরের লিপি অনুসারে প্রতিষ্ঠাকাল পাওয়া যায় ১৬২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এছাড়া অনেকাংশে অনুমানের উপর ভিত্তি করে সেন মহাশয় স্থির করেন প্রাচীন ভগ্ন জয়চণ্ডীর মন্দির হতে দেবী মূর্তি স্থানান্তরিত হয় প্রায় ৭০ কিমি দূরে কেশিয়াড়ি গ্রামের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের একটি লিপিতে রঘুনাথ শর্মা নামোল্লেখ দেখে তাঁর স্থির বিশ্বাস এই রঘুনাথ শর্মাই ব্রাহ্মণভূমের জমিদার মুকুন্দের কাব্য রচনার প্রেরণাদাতা। কিন্তু রঘুনাথ শর্মার রাজত্বকালের (১৫৭৩-১৬০৩) শেষ হওয়ার পরে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের জগমোহন এবং সর্বমঙ্গলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় চক্রধর শর্মার দ্বারা। এবং এই চক্রধর শর্মাকেই রঘুনাথ রায়ের পুত্র বলে তিনি দাবি করেন। যাইহোক লিপিতে উল্লিখিত 'ভূমিপ রঘুনাথ শর্মা' আর ব্রাহ্মণভূমের জমিদার রঘুনাথ একই ব্যক্তি নন। সেন মহাশয় এবং তাঁকে অনুসরণ করে পরবর্তী অনেক সমালোচক, লেখক এই সালকে ধরে চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময়কাল বিচারের প্রয়াসী হয়েছেন। আমাদের বিচারে এইরকম ধারণা বহুলাংশে ভ্রান্ত।

Discussion:

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে মেদিনীপুরের ভৌগোলিক পরিচিতি (আংশিকভাবে হলেও) যাঁর কলমে প্রথম লিপিবদ্ধ হয় তিনি অভয়ামঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। ষোড়শ শতকের শেষ দশক হতে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে রচিত (মানসিংহের রাজ্যাঙ্ককে মাথায় রেখে) এই গ্রন্থে অবিভক্ত মেদিনীপুরের বেশ কিছু স্থান-নাম, নদ-নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সাহিত্য-গ্রন্থ হিসেবে এতেই প্রথম মেদিনীপুর নামের আভাস পাওয়া যায়। ধনপতির সিংহল যাত্রা পথেই দেখা যায় ছত্রভোগ (মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) পেরোনোর পর 'ডাহিনে মেদনমল্ল' ভূমির অবস্থান। (প্রকৃতপক্ষে এখনকার মানচিত্রেও সাগর অভিমুখে হুগলি নদীতে যাওয়ার সময় বাম দিকে ডায়মন্ড হারবার আর ডাইনে মেদিনীপুরের ভূভাগ)। আবার শ্রীমন্তের যাত্রাকালে দেখি 'হিজুলীর পথ' 'বিষ্ণুহরির দেউল' (তমলুকে অবস্থিত বর্তমান জিষ্ণুহরি মন্দির) 'শাঁকরাঢ়া' (তমলুক শহরে অবস্থিত বর্তমান শংকর আড়ার প্রাচীন নাম বোধ হয়। ওখানে এখনো অতি প্রাচীন বারুণী ও মকর স্নানের মেলা বসে) প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ।[১]

এছাড়া চণ্ডীর আদেশে মগরার উদ্দেশ্যে ধাবমান নদনদীদের মধ্যে মেদিনীপুরের লুপ্ত এবং অধুনা বর্তমান কিছু নদ-নদীর নাম পাওয়া যায়–'সিলাই', 'কুবাই', 'বাগড়ির খাল' (প্রাচীন বগড়ি পরগনার অন্তর্গত), 'ঝুমঝুমি' 'তারাজুলি' (সম্ভবত তারাফেনী) 'মন্তেশ্বর', 'কংশাবতী' 'কাঁসাই', 'কাল্যাঘাই', 'সুবর্ণরেখা'।[২]

এছাড়া কার্তিকের তীর্থ পর্যটনে উল্লিখিত হয়েছে 'তমুলুপ্তে বিষ্ণু হরি দেখে বর্গভীমা / কপাল মোচনে স্নান সুকৃতির সীমা।'

আবার (হয়তো) কবির কিংবা কবির কিছু পরে গায়েনদের রচিত সর্বদেব বন্দনা অংশে মেদিনীপুরের আরো কিছু স্থান-নাম ও দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্দ্রকোনার মল্লেশ্বর, তমলুকের বিষ্ণুহরি এবং দেবী বর্গভীমা, নারায়ণগড়ের ব্রহ্মাণী, বেতার সর্বমঙ্গলা, খেপুতের খেপাই দেবী।[৩]

এই মুকুন্দরামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে মেদিনীপুরের প্রাচীন মহাল ব্রাহ্মণভূমের নাম। আইনি আকবরী অনুসারে টোডরমলের রাজস্ব বিভাগে উড়িষ্যা প্রদেশের পাঁচটি সরকারের মধ্যে অন্যতম সরকার জলেশ্বরের (২৮টি মহলের মধ্যে) অন্তর্গত ছিল ব্রাহ্মণভূম মহাল।[৪] পরবর্তীতে নবাবী আমলে মুর্শিদকুলি খাঁ যখন সমগ্র বাংলাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত করেন, উত্তর মেদিনীপুরের বেশিরভাগ অংশ তথা

ব্রাহ্মণভূম তখন চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত ছিল। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি আমলে এই পরগনা বর্ধমান রাজার হস্তগত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে এই ব্রাহ্মণভূম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭২ থেকে ৭৮ খ্রিস্টাব্দে রেভিনিউ সার্ভের সময় মেদিনীপুরে যে ১১৫টি পরগনা বিভাগ লক্ষিত হয়, সেখানে ব্রাহ্মণভূমের আয়তন ৯৩.৬৬ বর্গমাইল। বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী থানার অন্তর্গত আড়রা গ্রাম এই ব্রাহ্মণভূমের কেন্দ্রবিন্দু। এখানেই বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণভূমের ব্রাহ্মণ জমিদাররা রাজত্ব করে গেছেন। পরবর্তীতে বর্গী আক্রমণের সময় এই বংশীয়রা ডেবরার ত্রিলোচনপুরে এবং আরো পরে আড়রা থেকে কিছু দূরে সেনাপোতা গ্রামে গড় স্থাপন করে এখনো বসবাস করছেন।

আড়রা বর্তমানে দুটি অংশে বিভক্ত। বাজার আড়রা এবং গড় আড়রা। গড় আড়রা এখন পরিত্যক্ত ভূমি। কেবল পূর্ব-পশ্চিমে লম্বিত সুবৃহৎ পুষ্করিণীর চারপাশের সুউচ্চ পাড়, দক্ষিণ পাড় সংলগ্ন উচ্চভূমিতে জমিদারের ভদ্রাসনের শেষ চিহ্ন হিসেবে কিছু মাকড়া পাথরের উঁচু ঢিবি জঙ্গলের মধ্যে বর্তমান। ভদ্রাসনের পশ্চিমে রাণীর পুকুর ঘাসে ঢাকা। আর পুরো ভদ্রাসনটিকে ঘিরে থাকা পরিখার চিহ্ন এখনো পরিদৃশ্যমান। তবে পরিখার কিছু অংশ এবং পুবের আমবাগান এখন চাষযোগ্য জমিতে ক্রমশ রূপান্তরিত। সুবৃহৎ পুষ্করিণীটি বহুকাল আগে স্থানীয় দত্তদের বিক্রি করা হয়েছে। আর দক্ষিণের আবাসস্থলের উঁচু অংশ এখন সরকার অধিগৃহীত। জমিদার বাড়ির সঙ্গে গড় আড়রার বর্তমানে আর কোন সংযোগ নেই। তবে কয়েক দশক আগে পর্যন্তও বাজার আড়রার অদূরে জয়চণ্ডী মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ব্রাহ্মণভূমের জমিদার অধুনা সেনাপোতাগড়ের দেব বংশের (বর্ধমান রাজার নিকট হতে এঁরা দেব উপাধি প্রাপ্ত হন)। বিশেষত দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে। জয়চণ্ডীর মন্দিরে পুজো দিয়েই একদা সেনাপোতা গড়ের অষ্টাদশ ভুজা দেবী দুর্গার পুজো শুরু হতো। কিন্তু সে আজ অতীত। জমিদার বাড়ির বংশধর তাপস দেবের সূত্রে এই খবর প্রাপ্ত। গড় আড়রা হতে বর্তমানে বড়ো রাস্তা ধরে দেড় কিমি আর সোজা বনপথে এক কিমিরও কম দূরে অবস্থিত জয়চণ্ডীর মন্দির। এই জয়চণ্ডীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং দেবীর ইতিহাস নিয়ে নানান কিংবদন্তি এবং স্থানীয় গবেষকদের মধ্যে নানান মতদ্বৈধতা বর্তমান। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা এই মন্দির ও দেবী সম্পর্কিত নানান অভিমত পর্যালোচনার মাধ্যমে সত্যাসত্য বিচারের প্রয়াসী হবো।

গড় আড়রা সম্পর্কিত তথ্য প্রথম লিপিবদ্ধ করেন (১৮৮৭ খ্রি.) রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়। তৎকালীন মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামাক্ষর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হতে তিনি রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল (১৫৭৩-১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ) ও তাঁর বংশাবলী সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি জয়চণ্ডী মন্দির সম্পর্কিত কোনো তথ্য উল্লেখ করেননি।[৫] এ সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য আলোচিত হয়েছে সুকুমার সেনের কবিকঙ্কন চণ্ডীতে। তিনিই প্রথম জানান—

"বাঁকুড়া রায় ও রঘুনাথ রায় পিতাপুত্রে সেবিত জয়চণ্ডীর মন্দির কামেশ্বরের মন্দিরের কাছেই ছিল, – আরড়ার কিছু দূরে কোয়াঞি গ্রামে অবস্থিত। মন্দির এখন ভগ্ন। মনে হয় ভগ্ন মন্দির হইতে দেবী মূর্তি সরাইয়া দূরে কেশিয়াড়ী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 'সর্বমঙ্গলা' নামে। মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বাঁকুড়া রায়ের নাতি রঘুনাথের পুত্র চক্রধর ১৬০৪ অব্দে। মন্দিরের শিলালিপি পড়িয়া এই তথ্য জানাইয়াছিলেন বিনয় ঘোষ তাহার পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে।" [৬]

এই অভিমত থেকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আলোচনার সূত্র হিসেবে উঠে আসে—

১) বাঁকুড়া রায় ও রঘুনাথ রায়ের পূর্ব হতেই জয়চণ্ডীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

২) জয়চণ্ডী মন্দিরের অবস্থান আরড়ার বর্তমান জয়পুর গ্রামে নয়, বেশ দূরবর্তী কোয়াঞি গ্রামে।

৩) জয়চণ্ডী মন্দিরের মূর্তি আড়রা হতে দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে স্থানান্তরিত।
৪) এই কেশিয়াড়ির সর্বমঙ্গলা মন্দির আড়রার জমিদার রঘুনাথের পুত্র চক্রধরের প্রতিষ্ঠিত।

আমরা একে একে এই প্রত্যেকটি বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করতে পারি। সুকুমার সেনের অভিমত অনুসারে বাঁকুড়া রায় যদি জয়চণ্ডীর সেবা করতেন তাহলে মন্দির তাঁর আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এবং রঘুনাথের ক্ষেত্রেও সেই যুক্তি খাটে। তিনি আরো জানান 'ইঁহারা গোপালের ও কামেশ্বর শিবের সেবক ছিলেন। স্থানীয় অধিদেবী জয়চণ্ডী।'[৭]

কিন্তু কথা হলো যদি জয়চণ্ডী মন্দির মুকুন্দরামের আগমনের পূর্বে বাঁকুড়া রায় কিংবা কবির স্থিতিকালে রঘুনাথ রায় প্রতিষ্ঠা করতেন, তাহলে কবি কাব্যের বন্দনা অংশে কিংবা গ্রন্থোৎপত্তি অংশে তাঁর উল্লেখ করতেন। কারণ তিনি বা তাঁর পালার গায়েন (প্রসাদ দেব হতে পারেন কিংবা পরবর্তীকালের কোন গায়েন হলেও হতে পারেন) যেখানে অদূরবর্তী নেড়াদেউলের কামেশ্বর শিব, গড়বেতার সর্বমঙ্গলা, চন্দ্রকোনার মল্লেশ্বর দেবতাদের বন্দনা করছেন সেখানে আপন জমিদার প্রতিষ্ঠিত বা সেবিত 'অধিদেবী' জয়চণ্ডীর বন্দনা করবেন না বা তার কোনো উল্লেখ থাকবে না এটা কি খুব সঙ্গত? তাছাড়া কোনো কোনো পুঁথির তথ্য অনুসারে চণ্ডীমঙ্গল গীত হয়েছিল আড়রা থেকে কমপক্ষে ১০ কিমি (বর্তমানের হিসেবে সোজা গ্রামীণ পথ ধরে গেলে) নেড়াদেউলের কামেশ্বর শিব মন্দিরে। স্থানীয় জনশ্রুতিও তাই বলে। 'অষ্টমঙ্গলা সায় / শ্রীকবিকঙ্কন গায় / অমর সাগর মুনিবরে', শেষ লাইনটির পাঠান্তর 'শ্রীঅমর সোমের মন্দিরে' অথবা 'শ্রী কামেশ্বর মন্দিরে'। এই 'অমর সাগর মুনিবরে' শ্লোকাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ১৪৭৭ শকাব্দ বা ১৫৫৫- ৫৬ খ্রিস্টাব্দকে কাব্য রচনার সমাপ্তিকাল বলে দাবি করেছেন সেন মহাশয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সুখময় মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বহু পণ্ডিত এই দাবি নাকচ করে দিয়েছেন যেহেতু বেশিরভাগ পুঁথিতে এই পংক্তি পাওয়া যায়নি। যাইহোক এখন সে গোলকধাঁধায় ঢুকলে পথ হারানোর সম্ভাবনা বেশি। তাছাড়া প্রবন্ধের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সংকুলান হবে না। আমাদের প্রশ্ন, আচ্ছা যদি জয়চণ্ডী মন্দির বাঁকুড়া রায়ের আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে রঘুনাথের রাজ্যাধিকারে যখন চণ্ডীমঙ্গল লেখা শেষ হলো তখন সে কাব্য সেই মন্দিরেই গাওয়া যেতে পারত। কারণ চণ্ডীর মঙ্গলগাথা চণ্ডী মন্দিরে গীত হওয়া সবচেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত। শিব মন্দিরে নয়। এখনো যেমন শীতলামঙ্গল গান শীতলা মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে জয়চণ্ডীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা লিপিতে (যেটির সন্ধান মূল মন্দির ধ্বংসের পরে আর পাওয়া যায় না) একটি কালাঙ্ক-শ্লোক ছিল। সেটি সংগ্রহ করেছিলেন প্রণব রায় এবং দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। দীনেশ বাবুই সুখময় মুখোপাধ্যায়কে লিপিকালটি সম্পর্কে প্রথম অবহিত করেন –এ কথা 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে জানিয়েছেন সুখময় বাবু। শ্লোকটি নিম্নরূপ—
'শকে শিশির বেদেষু বিধৌ সমস্ত রবি যুগে/ প্রাসাদং কারয়ামাস শ্রীধর দ্বিজভূপতি'।
এর ওপর নির্ভর করে রায় মহাশয় ১৫৪১ শক বা ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দ আর সুখময় বাবু ১৫৪৫ শক বা ১৬২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দ নির্ণয় করেছেন। কিন্তু ইনারা কেউই অংকটি বিশ্লেষণ করেননি তাঁদের গ্রন্থে। বিশ্লেষণ করলে ১৫৪১ সাল কোনোভাবেই আসে না। বিশ্লেষণের ধাঁধায় বেশ কিছুটা দিকভ্রান্ত হতে হয়। তবু এরূপ ধরা যায়—
শিশির-৫, বেদ-৪, বিধু-১, এরপর 'সমস্ত রবিযুগে' কথাটির ব্যাখ্যা পাওয়া বড় মুশকিল। কেবল 'রবি' ১ হতে পারে। কিন্তু 'সমস্ত রবি' বললে দ্বাদশ রবিকে বোঝায়। অর্থাৎ সংখ্যা হবে ১২। আর যুগ -৪। এখান থেকে

'অঙ্কস্য বামাগতি'র নিয়মে ১৫৪৫ শক নির্ণয় করা বড় চাপের। এক্ষেত্রে বিধু এবং রবিকে ১-১ পাশাপাশি বসিয়ে ১১ এবং তার সঙ্গে যুগের চার যোগ করলে ১৫ সংখ্যাটি দাঁড়ায়। সেই সাপেক্ষে ১৫৪৫ হতে পারে। কিন্তু ১৫৪১ কোনোভাবেই নয়। যাই হোক এই নির্ণয় থেকেও প্রমাণিত হয় জয়চণ্ডী মন্দির ১৬২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ব্রাহ্মণভূমের দ্বিজ শ্রীধর নামক কোন জমিদারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ তিনি রঘুনাথের পরবর্তী কালের ব্যক্তি নিঃসন্দেহে। হয়তো পরবর্তী বংশধর। সুতরাং জয়চণ্ডী বাঁকুড়া রায় ও তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়ের দ্বারা সেবিত হতেন সেন মহাশয়ের একথা যথার্থ নয়।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় বিষয়ে। সেন মহাশয় তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে 'দেবী জয়চণ্ডী সর্বমঙ্গলা' পরিচ্ছেদে জানিয়েছেন জয়চণ্ডীর মন্দির কামেশ্বর মন্দিরের কাছেই ছিল, আড়রার কিছু দূরে কোয়াঞি গ্রামে। কিন্তু একই গ্রন্থে 'কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী' পরিচ্ছেদে আড়রার পরিচয় দিতে গিয়ে ৪৮ নং তথ্যসূত্রে উল্লেখ করছেন 'জয়চণ্ডী দেবীর প্রাচীন মন্দির আরড়া গ্রামের উত্তর-পূর্বে প্রায় ১ মাইল তফাতে জয়পুর গ্রামে আছে। কামেশ্বরের প্রাচীন মন্দির কোয়াঞি(আধুনিক কুয়াই) গ্রামে অবস্থিত। এ সংবাদ ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সৌজন্যে পাইয়াছি।'[৮]
প্রথম তথ্যটি তিনি কার সৌজন্যে পেয়েছিলেন আমাদের জানা নেই। তবে তথ্যটি ভ্রান্ত। জয়চণ্ডীর প্রাচীন মন্দির জয়পুর গ্রামেই অবস্থিত ছিল। মন্দিরটি বেশ কয়েকবার সংস্কার করা হয়। শেষ সংস্কার হয়েছিল ১৭৫১ শকাব্দে (১৮২৯-১৮৩০ খ্রি.) নিত্যানন্দ সিংহের সহায়তায় — মন্দিরের সংস্কার লিপি পাঠে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রণব রায় মহাশয়।[৯] তবে স্থানীয় মানুষজনের তথ্য অনুসারে মন্দিরটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় বিশ শতকের আশির দশকে। মূল মন্দিরটি কেমন ছিল তা আর বলার উপায় নেই। তবে বর্তমান মন্দিরের পেছনে পুকুরঘাটের অদূরে পড়ে থাকা পুরাতন মন্দির চূড়ার ক্ষয়প্রাপ্ত আমলক শিলাটি খুব বেশি বড় নয়। গ্রাম্য লোকেদের তথ্য অনুসারে ৩০ ফুটের মতো উঁচু ছিল মন্দিরটি। ২০২২-এ প্রকাশিত ব্রাহ্মণভূম বিষয়ক একটি বইতে জয়চণ্ডীর যে প্রাচীন মন্দিরের ছবিটি প্রদত্ত হয়েছে সেখানে দেখা যায় চারচালারীতির মন্দিরটির ওপরে একটি একরত্ন চূড়া রয়েছে।[১০] এই এক রত্ন চূড়ার উপরেই হয়তো ছিল ক্ষুদ্রাকার আমলক শিলাটি। সম্মুখের প্রবেশপথে ত্রিখিলান দৃশ্যমান। সমগ্র মন্দিরটি বেশ উঁচু পাথরের ভিত্তি বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরটি দেখতে অনেকটা বিষ্ণুপুরের কালাচাঁদ বা রাধামাধব মন্দিরের মতো। বর্তমানের মন্দিরটি পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট এবং সামনে নাট মন্দির। যাই হোক আমাদের বিচারে জয়পুর গ্রামেই ছিল জয়চণ্ডীর প্রাচীনতম মন্দির। এবং জয়চণ্ডীর নামানুসারেই গ্রামের নামকরণ।

তৃতীয় বিষয় মূর্তি স্থানান্তরের কথা। এই বিষয়টি পুরোপুরি সেন মহাশয়ের স্বকপোল কল্পিত। উত্তর মেদিনীপুরের আড়রা হতে দক্ষিণ মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটারের কম নয়। (বর্তমানের বড়ো সড়কের ঘুরপথে প্রায় ৯০ কিলোমিটার)। তাঁর যুক্তিতে যদি জয়চণ্ডী মন্দির ধ্বংস হওয়ার কারণে মূর্তি স্থানান্তরিত হয়, তবে আমাদের মতে ব্রাহ্মণভূম পরগনার মধ্যেই কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে জমিদাররা মূর্তি স্থাপনা করতে পারতেন। তা না করে সুদূর কেশিয়াড়িতে গিয়ে মন্দির ও মূর্তি স্থাপনা করার প্রয়োজনীয়তার হেতু কী? তাছাড়া কেশিয়াড়ি তখন ভঞ্জভূম বারিপদার অন্তর্গত 'গাগনাপুর' বা 'কুকনাপুর' (বর্তমান নাম গগনেশ্বর বা কুকাই, যেখানে উৎকলরাজ কপিলেশ্বর দেবের (১৪৩৫-১৪৭০) নির্মিত কুরুমবেড়া দুর্গ বর্তমান) মহালের অন্তর্গত একটি গ্রাম (গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন। অষ্টাদশ শতকের 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থেও এর প্রচুর উল্লেখ আছে।) তাছাড়া বর্তমান আড়রা গড়ের জয়চণ্ডী দেবীর রূপের সঙ্গে কেশিয়াড়ি সর্বমঙ্গলা দেবীর কোনো মিল

নেই। প্রস্তর নির্মিত সর্বমঙ্গলা দেবী দ্বিভুজা, বরদা হস্তা, বস্ত্রাবৃতা বলে উপবেশনের ভঙ্গিটি বোঝার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া মন্দিরে কোনো ভাবে ফটো তোলার নিষেধ থাকায় কোনো লেখকের গ্রন্থে এই দেবীর ছবি পাওয়া যায় না। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। কেবলমাত্র 'মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিবর্তন' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড,দ্বিতীয় ভাগের পরিশিষ্টে একটি ছবি প্রদত্ত হয়েছে। তবে শতাধিক বর্ষ পূর্বে (১৯২১ খ্রি.) যোগেশচন্দ্র বসু মূর্তিটির যে উপবেশন ভঙ্গির বর্ণনা দিয়েছেন সেখান থেকে বোঝা যায় দেবী ললিতাসনা। দক্ষিণ পদ পাদপীঠের নিম্নস্থিত সিংহের ওপর স্থাপিত। অপরদিকে জয়চণ্ডী দেবী দশভুজা দণ্ডয়মানা মন্দিরের দেওয়ালেই খোদিত মূর্তি। ব্রাহ্মণভূমের জমিদার সম্ভবত আলালনাথ দেব (জমিদার বাড়ির উত্তরসূরিদের মুখে শোনা) অষ্টাদশ শতকে যে ঝাড়েশ্বর শিব মন্দির নির্মাণ করেন, সেখানেও দেখা যায় মন্দির দেওয়ালে খোদিত অষ্টাদশ ভুজা দেবীপ্রতিমা দণ্ডায়মানা। আসলে উত্তর মেদিনীপুরে দেওয়ালে খোদিত দশভুজা বা অষ্টাদশভুজা দুর্গা মূর্তি নির্মাণের একটি ধারা লক্ষিত হয়। নিকটবর্তী গড়বেতার সর্বমঙ্গলা, কিংবা দাসপুরের খেপুতেশ্বরী দুর্গাও দশভুজা।
এই মূর্তি পরিচিতি দানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় আমাদের আড়রার জয়চণ্ডী এবং কেশিয়াড়ির সর্বমঙ্গলা দুটি পৃথক স্থানের পৃথক শৈলীর মূর্তি। তাই এই মূর্তি স্থানান্তরের যুক্তি খুব একটা গ্রাহ্য করা যায় না।

এইবার চতুর্থ বিষয়টির উপর আলোকপাত করে আমরা প্রবন্ধের ইতি টানবো। শ্রী সেন, বিনয় ঘোষের গ্রন্থে কেশিয়াড়ির সর্বমঙ্গলা মন্দিরের লিপি নির্ভর তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন এই মন্দির রঘুনাথের পুত্র চক্রধরের নির্মাণ। এবং তাঁর পরবর্তীতে সুখময় মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সনৎকুমার নস্কর মহাশয় পর্যন্ত সবাই এই তথ্যকে গ্রহণ করেছেন চণ্ডীমঙ্গলের কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে।

এবার আসা যাক সর্বমঙ্গলা মন্দিরে উৎকীর্ণ তিনটি লিপির প্রসঙ্গে।

- প্রথম শিলালিপিটি রয়েছে মন্দিরের বারদুয়ারীর পূর্ব দেওয়ালে। প্রায় ৪ ফুট দৈর্ঘ্যের এবং দেড় ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট প্রস্তর ফলকে ওড়িয়া হরফে খোদিত লিপিটি এখন প্রায় অস্পষ্ট বারংবার রংয়ের প্রলপের ফলে।
- দ্বিতীয় শিলালিপিটি রয়েছে জগমোহনের দেওয়ালে।
- তৃতীয় লিপিটি প্রায় এক ফুট দৈর্ঘ্যের পেতলের বিজয়া মঙ্গলা মূর্তির পাদদেশে সিংহাসনের গায়ে।

এই লিপি তিনটির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়। কিন্তু তাঁর গ্রন্থে লিপির কোনো মূল পাঠ বা প্রতিকৃতি নেই। বার দুয়ারীর লিপিটির চিত্র রায় মহাশয়ের গ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু জগমোহনের শিলালেখের প্রতিলিপি এবং পাঠ কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু বিজয়া মঙ্গলার সিংহাসন তলে খোদিত লিপিটির মূল পাঠ তুলে ধরেছেন বিনয় ঘোষ মহাশয়। মন্দিরে ফটো তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলে বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও বারদুয়ারীর লিপিটি তুলতে পারেননি। তবু চেষ্টায় আছেন। বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে বারদুয়ারী লিপির যে অর্থ দিয়েছেন তা হুবহু যোগেশ বসুকে অনুসরণ করে। যাইহোক বারদুয়ারী লিপিতে উল্লিখিত বিষয় হলো—
মহারাজা মানসিংহের নিযুক্ত শাহ সুলতান কেশিয়াড়ি রাজস্ব কেন্দ্রের শাসক ছিলেন। তাঁর অধীনস্থ সুন্দর দাস নামক কর্মচারী এবং অর্জুন মহাপাত্র নামক দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে বনমালী দাস নামক রাজমিস্ত্রী বারদুয়ারী নির্মাণ করেন। লিপিকাল ১৫৩২ বা ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ।

এবার আসা যাক তৃতীয় লিপিটির বিষয়ে (বিশেষ কারণে আমরা দ্বিতীয় লিপির কথাটি পরে বলবো)। তৃতীয় লিপিটির পাঠ বিনয় বাবুর অনুসরণে নিম্নরূপ—

‘শ্রীমানসিংহ মহারাজ শুভ রাজ্যে নিজ কুলে কুমুদানন্দ শ্রীল রঘুনাথ শর্মা ভূমিপ সূত শ্রীচক্রধর শর্মা প্রকাশিলে সর্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থিতি। শকাব্দ ১৫২৬ কামিলা রতুপাত্র।’[১১]

আমরা এর অনুবাদ করতে পারি মানসিংহের শুভ রাজত্বকালে ভূমিপতি রঘুনাথ শর্মার নিজ বংশজ পুত্র শ্রী চক্রধর শর্মা সর্বমঙ্গলার প্রতিমা প্রকাশ (প্রতিষ্ঠা) করেন।

বিশেষ প্রয়োজনে এই লিপি সম্পর্কিত বিনয় ঘোষের তথ্যটুকু জানা প্রয়োজন— ‘এই শিলালিপি থেকে জানা যায়, কেশিয়াড়ী অঞ্চলে রঘুনাথ ভূঞা নামে কোনো জমিদার ছিলেন। ১৫২৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে, মহারাজা মান সিংহের রাজ্যে, তাঁর পুত্র চক্রধর ভূঞা সর্বমঙ্গলার এই দেবী মন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠা করেন।’[১২]

আচ্ছা এই তৃতীয় লিপিটির মূল পাঠেতো কোথাও বলা হয়নি জগমোহনের কথা বা মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা। বলা আছে ‘সর্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থিতি’ অর্থাৎ দেবী প্রতিমা স্থাপিত হয়। এবং যার নির্মাতা ছিলেন সম্ভবত ‘কামিলা রতু পাত্র’। মন্দির নির্মাণকারীকে ‘কামিলা’ বলার চল মধ্যযুগে খুবই কম। কামিলা বলতে মূলত স্বর্ণ-রৌপ্যের কারিগরকে বোঝায়। সেই সূত্রে ধাতব মূর্তির কারিগরকেও বোঝানো স্বাভাবিক। যাইহোক এখান থেকে স্পষ্ট রঘুনাথ শর্মার পুত্র চক্রধর শর্মা দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেননি, কেবল দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু সুকুমার সেন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বেশিরভাগ গবেষক ও লেখক এই লিপিটির উল্লেখ করে চক্রধরকেই জগমোহন ও দেবী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবি করেছেন। আরেকটি বিষয় ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ এই লিপিটি বিজয়া মঙ্গলা মূর্তির পাদদেশে রয়েছে। তাহলে বিজয়া মঙ্গলা মূর্তির কি আদিনাম সর্বমঙ্গলা? কারণ মূর্তির পাদপীঠে খোদিত লিপি সেই মূর্তিরই পরিচায়ক। আর মন্দিরের গর্ভ গৃহে যে মূল পাথরের দেবী সর্বমঙ্গলা হিসেবে পূজিতা হন তিনি কি পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত নাকি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই ছিলেন?

এই তৃতীয় লিপিটির একটি বিশেষ পাঠ পরিকল্পনা করেছেন অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর।

তাঁর বিচারে— “ ‘প্রকাশিলে’শব্দটি অতীতকালের ক্রিয়ার সঙ্গে -‘এ’ অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া-বিভক্তিযোগে নিষ্পন্ন, যার অর্থ ‘প্রকাশিত হলে’ অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হলে। অথচ গবেষকগণ এতদিন এর অর্থ করেছিলেন ‘মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন’ ”।[১৩] সুতরাং তাঁর মতে রঘুনাথ রায়ের পুত্র শ্রীধর জন্মালে সর্বমঙ্গলা মন্দির ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের যুক্তি লিপিটি ওড়িয়া। এবং ভাষাটিও ওড়িয়া। ওড়িয়াতে অতীতকালে মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমার্থে ‘-ল্’/ -‘ইল্ প্রত্যয়ের শেষে ক্রিয়া সহায়ক ‘-এ’ যুক্ত হয়।

যেমন—

(সাধারণ অর্থে)— তমে করিল। (তুমি করলে।)

(সম্ভ্রমার্থে)— আপণ করিলে। (আপনি করলেন।)

আপণ কহিলে। (আপনি বললেন।)

দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের বাংলা প্রভাবিত ওড়িয়া ভাষাভাষী মানুষজন এখনো সম্মানার্থে এই সমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং পূর্ববর্তীদের পাঠের অর্থকে ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভুল বলা যায় না।

নিজের এই যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি রামগতি ন্যায়রত্নের উল্লিখিত (যা তিনি রামাক্ষর চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন) রঘুনাথ রায়ের রাজ্যাধিকার কালকে (১৫৭৩ - ১৬০৩ খ্রি.) ‘প্রমাদপূর্ণ’ বলে দাবি করেছেন। এবং এই সময় কালকে বাঁকুড়ারায়ের রাজত্বকাল হিসেবে ধরে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দকে রঘুনাথ রায়ের পুত্র চক্রধরের জন্মের সময়কাল বলে মেলানোর চেষ্টা করেছেন।[১৪]

এবার আসা যাক দ্বিতীয় লিপিটির কথায়। সবচেয়ে ধোঁয়াশা এটি নিয়ে। কারণ এর কোনো পাঠ কেউ দেননি। শুধু অর্থ উল্লেখ করেছেন। আর বর্তমানে লিপিটি বারংবার রংয়ের প্রলেপে একেবারেই অস্পষ্ট। যোগেশবাবু আবার তৃতীয় এবং দ্বিতীয় দুটি লিপির অর্থ একসঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন। ফলে তৃতীয় লিপির শেষ কোথায় আর দ্বিতীয় লিপির শুরু কোথায় সেটা বোঝা বেশ সমস্যার। তিনি আবার জানিয়েছেন মহারাজা মানসিংহের তিন অঙ্কে সোমবার চক্রধর ভূঞা মন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫] পূর্বে উদ্ধৃত তৃতীয় লিপিটির মূল পাঠে কোথাও মানসিংহের 'তিন অঙ্ক' এবং 'সোমবার' কথা দুটি পাইনা। তবে 'কুমুদানন্দ'শব্দটি চাঁদ অর্থাৎ সোমকে বোঝালেও বোঝাতে পারে। আবার শব্দটি জমিদারকে বিশেষ বিশেষণেও (চন্দ্র সম স্নিগ্ধ উজ্জ্বল পুরুষ, যিনি অন্যকে বিকশিত হতে সাহায্য করেন) ভূষিত করতে পারে। যোগেশ বাবু কৃত লিপি ব্যাখ্যার উপরিউক্ত কথাগুলির পরবর্তী অংশ দ্বিতীয় লিপিটির বিষয়বস্তু বলে ধরে নিতে পারি আমরা। যোগেশ বসুর অনুসরণে এর তথ্যটি নিম্নরূপ—

হরিদাস নামক জনৈক ব্যক্তি সেই জমিদারের (অর্থাৎ রঘুনাথের) করণ ছিলেন এবং রঘুনাথ কামিলা এবং বাসুরাম কারিগর যথাক্রমে বিজয়া মঙ্গলা মূর্তি ও জগমোহন মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।[১৬]

যোগেশ বসু এর কোনো লিপি কাল উল্লেখ করেননি। কিন্তু বিনয় বাবু জানিয়েছেন 'এই লিপি থেকে জানা যায় যে, দেবী মন্দির ও জগমোহন ১৫২৬ শকাব্দে বা ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।'

এখানে খেয়াল করতে হবে দুই ব্যক্তির লিপি পাঠ ও তথ্য প্রদানের মধ্যে সাধর্ম এবং পার্থক্যটুকু। উভয়েই জগমোহন প্রতিষ্ঠার কথা বললেও যোগেশ বাবু বিজয়া মঙ্গলার কথা আর দ্বিতীয়জন দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সুকুমার সেন মহাশয় আবার বিনয় ঘোষের উক্ত মন্তব্যকে খণ্ডন করে জানিয়েছেন— 'কিন্তু আমি সরেজমিনে গিয়ে দেখেছি যে উক্ত শিলালিপিতে যে সাল লেখা আছে তা ১৫২৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০২ অব্দ।'[১৭]

১৬০২ খ্রিস্টাব্দ হলে সেন মহাশয়ের নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠাতে খুব সুবিধে হয়। ১৬০৩ পর্যন্ত রঘুনাথের রাজত্বকাল। সুতরাং 'ভূমিপ' বিশেষণটি তাঁর ক্ষেত্রে যথাযথ হয়। কিন্তু লিপিকাল ১৬০৪ হলে রঘুনাথকে 'ভূমিপ' বলা যায় না। আমাদের প্রশ্ন তাহলে পাঠক-গবেষকের নিকট শুদ্ধপাঠ কোনটি হবে? যেহেতু মন্দিরের মূল লিপি দেখার বা পড়ার আর কোনো সুযোগ আমাদের কাছে নেই।

পর্যায়ক্রমিক এই আলোচনা থেকে চণ্ডীমঙ্গলের দুটি নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় এই মন্দিরের। ১) রাজা মানসিংহ ২) রঘুনাথ শর্মা। মানসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি যেহেতু বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন, ফলে তাঁর নাম গ্রন্থে এবং মন্দিরে যথার্থভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সর্বমঙ্গলা মন্দিরে উৎকীর্ণ রঘুনাথ শর্মা এবং মুকুন্দের পৃষ্ঠপোষক আড়রার জমিদার রঘুনাথ রায় যে একই ব্যক্তি এর জোরালো প্রমাণ কোথায়? যেখানে রঘুনাথের রাজত্বকালের সমাপ্তির এক বছর পরে সর্বমঙ্গলা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তিনি তো তখন আর 'ভূমিপ' হতে পারেন না। কেবল ব্রাহ্মণত্ব আর নামের সাযুজ্য দেখেই উভয়কে মেলানো যথার্থ যুক্তি নয়। রঘুনাথের পুত্র যে চক্রধর এ কথাতো গ্রন্থে কোথাও নেই। বরং ব্রাহ্মণ ভূমের জমিদার বংশের অধস্তন পুরুষ রামকৃষ্ণদেবের নিকট হতে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মেদিনীপুরের বিশিষ্ট মন্দির গবেষক ও গ্রামের ইতিহাস লেখক চিন্ময় দাস মহাশয় রঘুনাথের পুত্র উমাপতিদেব, তাঁর পুত্র লোকনাথ, লোকনাথের পুত্র ত্রিলোচন দেব। এই ত্রিলোচন দেব বর্গী আক্রমণের সময় আড়রা পরিত্যাগ করে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার নিকট ত্রিলোচনপুরে জমিদারি স্থাপন করেন। এই বিষয়টি তিনি ব্যক্তিগতভাবেও বর্তমান প্রবন্ধের লেখককে জানিয়েছেন। যদি এ তথ্য সত্য হয়, (কারণ জমিদার বাড়ির কুলাখ্যান পত্র বর্তমান লেখকের স্বচক্ষে দেখা হয়নি) তাহলে কেশিয়াড়ির

সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সঙ্গে রঘুনাথের সংযোগ খোঁজা বাতুলতা মাত্র। তৃতীয় লিপিতে আরেকটি শব্দ খুব ভাবায়। রঘুনাথ রায় সম্পর্কিত 'ভূমিপ' বিশেষণটি। কথাটির অর্থ ভূমির অধিপতি। এক পরগনার জমিদার সুদূরবর্তী অন্য পরগনার ভূমিপ হওয়া একটু কঠিন। যদি না তিনি সেই অঞ্চল কোনোভাবে জয় করেন। সুতরাং বিশেষণটির দ্বারা রঘুনাথকে কেশিয়াড়ি অঞ্চলের বা তৎকালীন 'গাগনাপুর' বা 'কুকনাপুর' পরগনার অধিপতি বলেই বোধ হয়। তাছাড়া সর্বমঙ্গলা মন্দিরের জনশ্রুতিমূলক একটি প্রতিষ্ঠা-ইতিহাস উল্লেখ করেছেন যোগেশ বাবু। (১৮৫) মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করতে এসে জয়চণ্ডীর দেবী মূর্তি দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন জমিদার চক্রধর ভূঁইয়াকে মন্দির (মনে হয় মূল মন্দির নয়, জগমোহন অংশ) গড়ার আদেশ দেন। এবং সেবা পূজার জন্য দেবত্র ভূমির ব্যবস্থা করে দেন। এই ভূঞা জমিদাররা সাঁতরা গ্রামের জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ বলে কথিত আছে।

জনশ্রুতির সত্যাসত্যতা যাই থাক এখানে যে মান সিংহের পূর্ব হতে মন্দির এবং দেব-দেবী ছিলেন তার বড়ো প্রমাণ গর্ভগৃহে থাকা পাল-সেন পর্বের একটি প্রস্তর নির্মিত চতুর্ভূজা মহিষমর্দিনী এবং গণেশের মূর্তি।

সুতরাং সকল তথ্যের পূর্বাপর বিচারে আমাদের ধারণা জয়চণ্ডীর মন্দির রঘুনাথ রায়ের রাজ্যধিকারের পরে নির্মিত আর জয়চণ্ডীর মূর্তি স্থানান্তরের কাহিনী সুকুমার সেনসেন মহাশয়ের সম্পূর্ণ স্বকপোল কল্পিত।

Reference:

১. সেন, সুকুমার (সম্পা): কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫। পৃ. ২৩৮

২. তদেব, পৃ. ২৩৯

৩. তদেব, পৃ. ৩১৮-২০

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি (অনুবাদ): আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৭: পৃ. ৯১,১৫৬,১৬২

৫. ন্যায়রত্ন, রামগতি: বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় সং., ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০-৭১

৬. সেন, সুকুমার: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড, আনন্দ সং., ১৯৯১, পৃ. ৪৪৬

৭. তদেব, পৃ. ৪২১

৮. তদেব, পৃ. ৪৬৫

৯. রায়, প্রণব: জেলার প্রত্নসম্পদ: প্রত্নতত্ত্ব অধিকার : পশ্চিমবঙ্গ সরকার: ১৩৯৩: পৃ. ১৩৪

১০. রঞ্জিত, তপন তপন কুমার: ভাতঘর (ভঞ্জভূম| ব্রাহ্মণভূম| শ্যামচাঁদপুর), অরিন্দম'স, মেদিনীপুর ২০২২, পৃ. ৬১

১১. ঘোষ, বিনয়: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০০৮। পৃ. ১৩৪

১২. তদেব, পৃ. ১৩৪

১৩. নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.): কবিকঙ্কন-চণ্ডী, রত্নাবলী তৃতীয় সং., ১৪১৫, পৃ. ২৪

১৪. তদেব, পৃ. ২৩-২৪

১৫. বসু, যোগেশচন্দ্র: মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম ও ২য় ভাগ, সদেশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৪১৬, পৃ. ৩৬৫

.

১৬. তদেব, পৃ. ৩৬৪
১৭. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড: আনন্দ সং., ১৯৯১: পৃ. ৪৪৮

CC BY NC

.